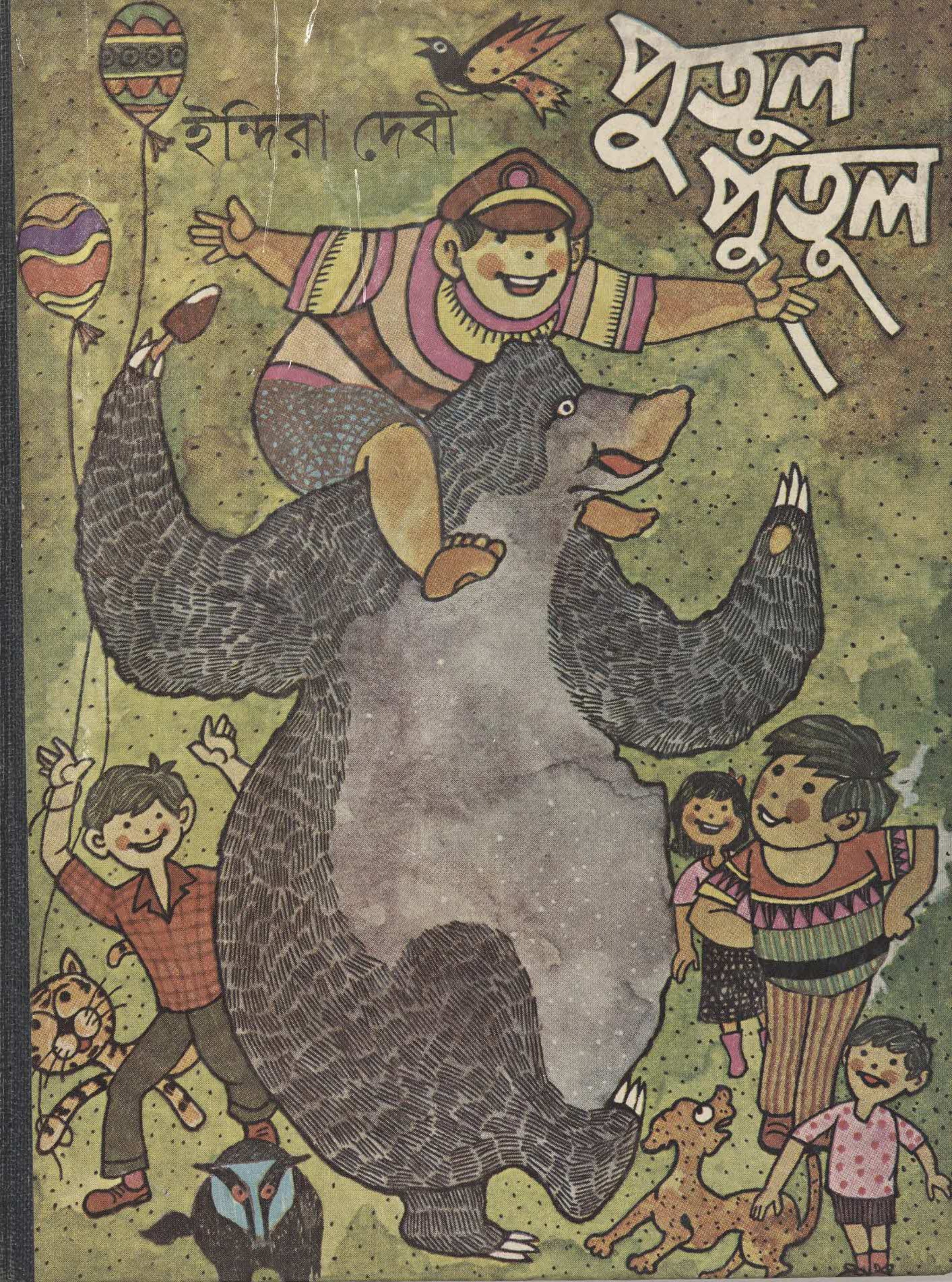
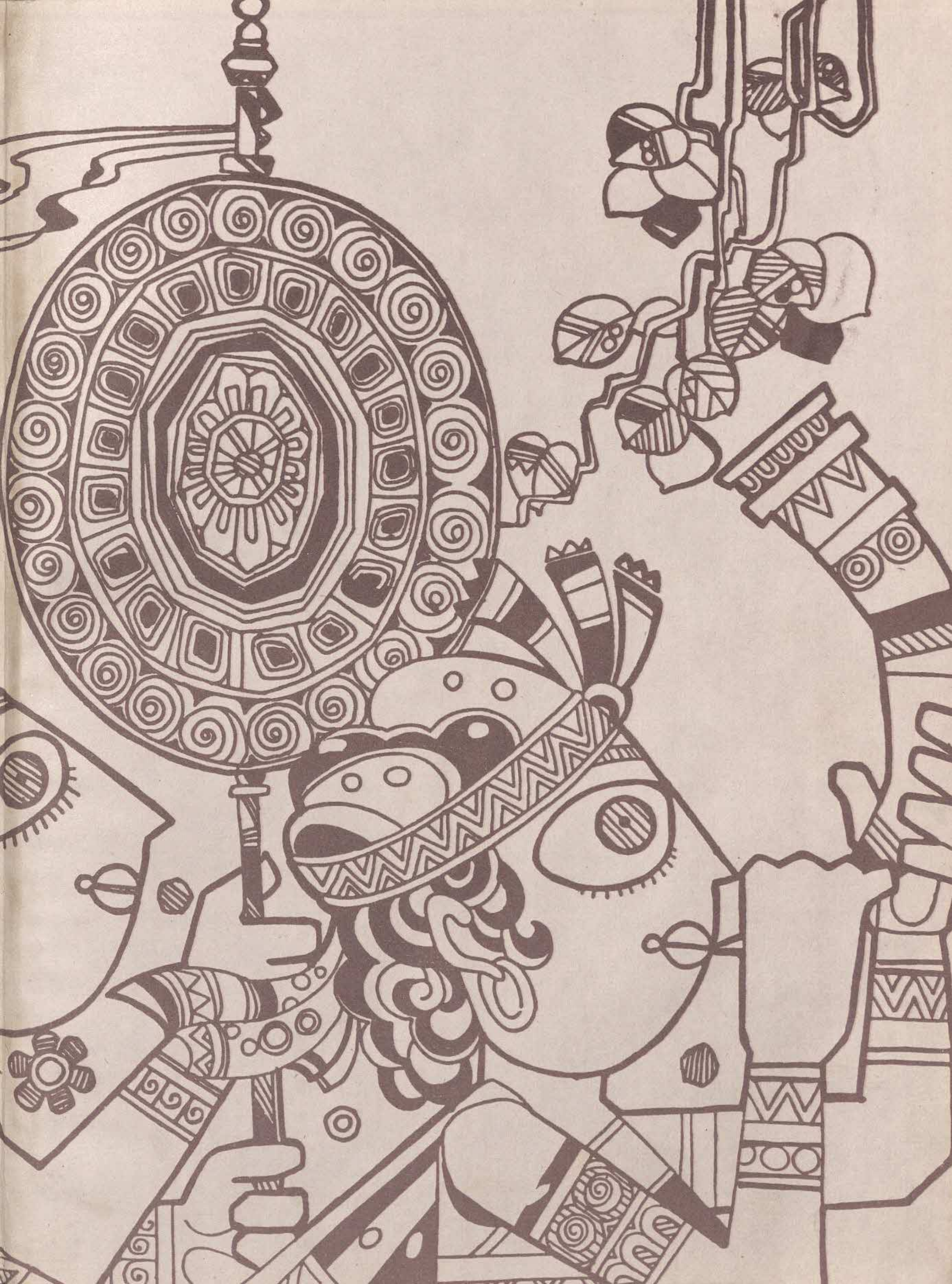

পুতুল পুতুল
ইন্দিরা দেবী





ইন্দিরা দেবী

পুতুল পুতুল



দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা

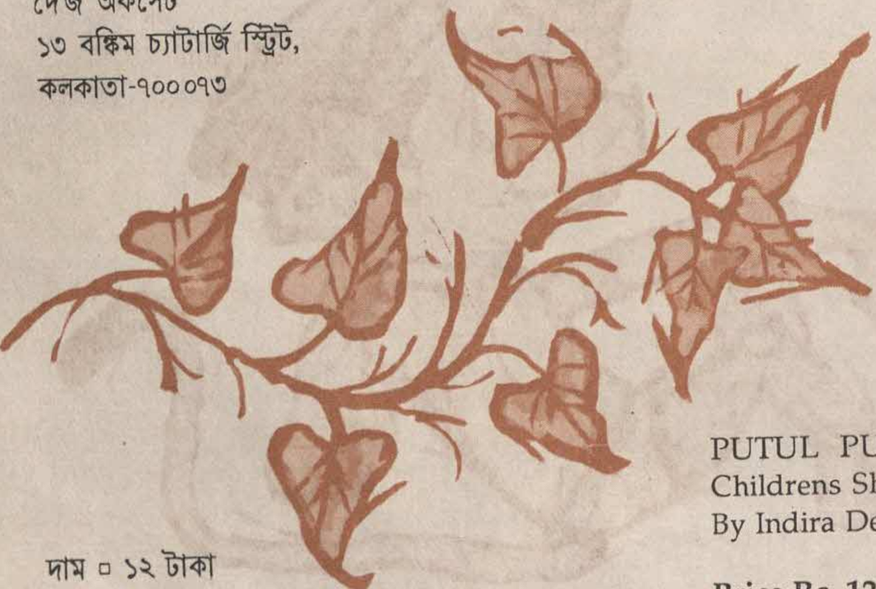
প্রকাশক ▫
শ্রী সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ▫
১৩৯১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ▫ মহালয়া ▫ ১৩৯৮



প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ▫ ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর ঃ
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭৩



PUTUL PUTUL
Childrens Short Story
By Indira Devi

দাম ▫ ১২ টাকা

Price Rs. 12.00

ট্রিংকা

ট্রিংকা কে জানো ? মুনকীর আদরের ভাল্লুক। মুনকী তখন খুব ছোট, বড় লক্ষ্মী মেয়ে বলে মা আদর করে কিনে দিয়েছিলেন। তারপর মুনকী তাকে কি যত্নই না করেছে। ওর আদর যত্ন দেখে খেলাঘরের অন্য পুতুলরা রাগ করতো মনে মনে—কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারতো না। আর ট্রিংকা যখন দোকান থেকে এসেছিল—মনে হতো ও বুঝি জমাট বরফের তৈরী। এত সুন্দর ও সাদা ধবধবে ছিল—তার মাঝে ওর ঝুটো মতির চোখ দু'টো চিকমিক করতো। যে দেখতো সেই বলতো, বাঃ কি সুন্দর ভাল্লুকটা। মুনকী ওকে কোলে নিয়ে চলে যেতো মনে মনে ভাবতো ওর নজর লাগছে। নজর লাগা কথাটা ও মার কাছে থেকে শিখেছে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। মুনকীর এখন রীতিমত স্কুল—তাই সব সময় ট্রিংকাকে দেখতে পারে না—তবুও খোঁজ খবর রাখে। ছুটির দিন খেলাঘর পরিষ্কার হয়—আর ট্রিংকার দেহও পরিষ্কার হয়।



কিন্তু কিছুদিন থেকে মুনকীর স্কুলে এত পড়াশোনার চাপ পড়েছে যে সে ছুটির বারেও নিয়মিত খেলাঘরে যেতে পারে না। খেলাঘরে একরাশ ধুলো জমেছে, এদিকে ট্রিংকাও ময়লা হয়েছে বিশ্রী রকমের।

মা একদিন বল্লেন ঃ তুমি কিছুই দেখ না মুনকী, পুতুলগুলোর দশা কি হয়েছে বলো তো ? আর ট্রিংকার অবস্থা কি করেছ ? মার বকুনী খেয়ে সেদিন স্কুলে যাবার আগেই মুনকী ট্রিংকাকে নিয়ে আর গোটা একটা আস্ত সাবান ও জলের বালতি নিয়ে বসে গেল। একটা ছোবড়া নিয়ে খুব করে ঘষে তার গায়ের ধুলো ময়লা তুলতে লাগলো।

এদিকে ট্রিংকা উঁ-উঁ-উঁ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু কে শুনছে তার কান্না ? মুনকী মার কাছে বকুনি খেয়েছে, তাই তার বরফের মতো সাদা চেহারা আবার ফিরিয়ে আনবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে। সেদিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওকে

পরিষ্কার করে বুরুশ দিয়ে গায়ের লোমগুলো ঠিক করে দিয়ে—অনেক পাউডার মাখিয়ে তাকে ড্রেসিং টেবিলের উপর বসিয়ে রেখে দিলে।

ট্রিংকা মাঝে মাঝে আয়নায় তার মুখ দেখে আর পরিষ্কার চেহারা দেখে খেলাঘরের অন্য পুতুলদের দিকে অহঙ্কার করে তাকায়। খেলাঘরে ট্রিংকার মত বড় একটা কালো কুকুর আছে,—ওকে ট্রিংকা দু'চোখে দেখতে পারে না। আগে বলতোঃ ম্যাগো কি বিচ্ছিরি কালো কুটকুটে।

স্ক্যাম্প এর যা রাগ হতো—রাগে তার নীল পুঁতির চোখ দু'টো জ্বলে উঠতো, মনে করতো দাঁড়াও না একবার বাগে পাই, শাদা চেহারা ঘুচিয়ে দেবো। মনে মনে ভাবলেও স্ক্যাম্প মুখে কিছু বলতো না।

ট্রিংকা ড্রেসিং টেবিলে মুখ দেখছে আর খেলাঘরের দিকে তাকাচ্ছে।

ঘরে কেউ নেই দেখে খরগোস চোখ পিট পিট করে বলে, কি ট্রিংকা দাদা এখানে নামতে হবে না ? আমরা না হয় আজ চান করিনি। মুনকীর সময় না হলে তো আমাদের গায়ের ধুলো ঝাড়া হবে না—কিন্তু তুমি আর কতক্ষণ ওখানে মুখ দেখবে ?

—তোরা যা নোংরা—মুখ ঘুরিয়ে ট্রিংকা বল্লে।

ওর কথা শুনে খেলাঘরের সব পুতুলরা হো হো করে হেসে উঠলো। বল্লে ঃ ইস্ রকম দেখে বাঁচি না। এতদিন এসব কথা ছিল কোথায়, ভাগ্যি আজ মুনকী চান করিয়েছে।

ট্রিংকা আবার আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে নিয়ে বল্লে ঃ যা, যা তোরা ভয়ানক নোংরা।

ওরা এবার সত্যি রেগে গেছে। বল্লে ঃ আচ্ছা দেখবো এখানে আসতে হয় কিনা।

দিন দুই পরে মুনকীর মা চুল বাঁধতে এসে ভারী অসুবিধা বোধ করলেন। একটা মস্ত ভাল্লুক পুতুল জায়গা জোড়া করে আছে, মুখ দেখা যায় না। চুল বেঁধে তিনি ট্রিংকাকে খেলাঘরে নামিয়ে রেখে এলেন।

সেদিন রাত্রে খেলাঘরে খুব হৈ চৈ হচ্ছে—বাড়ীর লোক তখন সবাই অগাধে ঘুমুচ্ছে।

কাঠের ঘোড়াটা টগবগিয়ে জায়গা থেকে নেমে এসে হাঁক দিল ঃ কি হে ট্রিংকা ভায়া, খবর কি ? আজ তোমার শুভাগমন হয়েছে—তাহলে খুব খাওয়া দাওয়া হচ্ছে তো ?

—খাওয়া দাওয়া ? কেন ? ট্রিংকা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিল।

—কেন ? বল কি তুমি, তুমি এমন সুসজ্জিত হয়ে এলে আমাদের ময়লা ঘরে—আমরা একটা ভোজ দেবো না ?

ট্রিংকা ঠোঁট উল্টে বল্লে ঃ তোমাদের ইচ্ছা ।

স্ক্যাম্প তার মোটামোটা কালো দেহ নিয়ে ট্রিংকার কাছে ঘেঁষে ঘুরে গেল আর দু'চারবার জোরে জোরে ডাক দিল ।

ট্রিংকা একটু সরে নাক তুলে বললে ঃ ম্যাগো কি কালো কুটকুটে । আজ বুঝি দু'খানা মাংসের হাড় বেশী পেয়েছে—তাই চেঁচাচ্ছে !

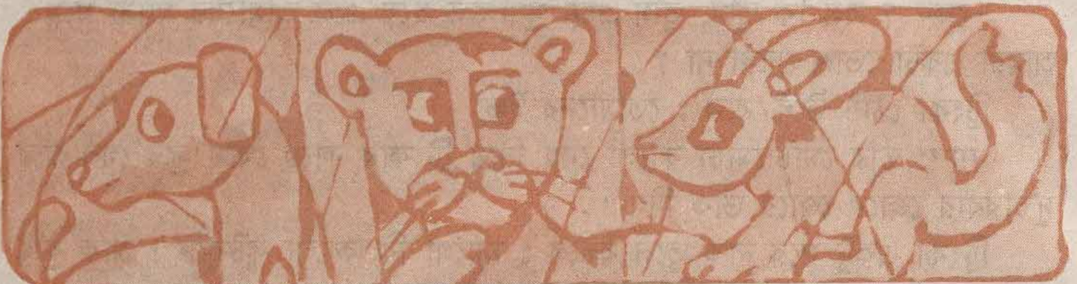
কিন্তু জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে থাকা যাবে কি করে । ট্রিংকার ব্যবহারে অন্য সব পুতুলগুলো দস্তুর মত চটে রইল ।

আবার অনেকদিন মুনকী ট্রিংকার গায়ে হাত দেয়নি—ধুলো ময়লায় চেহারা খারাপ হয়ে আসছে । ট্রিংকা বোঝে, দেখে—কিন্তু কি করবে ।

খেলাঘর সুদ্ধ পুতুলদের রাগিয়েছে, স্ক্যাম্পকে যা তা বলেছে, সবাই অসুন্দর আর ট্রিংকা নিজে সুন্দর এই কথা সে বলে । স্ক্যাম্পের ইচ্ছা করে মুনকীকে বলে দেয়—কারণ মুনকী নিজে ইচ্ছা করে শাদা ভাল্লুক—আর কালো লোমওয়ালা কুকুর পছন্দ করে এনেছে । তাছাড়া খেলাঘর সুদ্ধ পুতুল সকলের সঙ্গে সকলের কি ভাব—কেবল ট্রিংকা রূপের গর্বে অস্থির ।

একদিন রাত্রে ট্রিংকা খেলাঘর থেকে বেরিয়ে মুনকীর পড়ার টেবিলের কাছে গেল । খেলাঘরের লোকদের সঙ্গে তো ওর মেলামেশা নেই—তাই টেবিলের কাছে গিয়ে চেয়ারে বসে খাতা বই পেনসিল নাড়তে নাড়তে হঠাৎ রং-এর বাক্স আর তুলিটা পেয়ে ওর আনন্দ ধরে না, ছবি আঁকতে বসে গেল । তুলির টানে ছবি আঁকা যায় তা সে মুনকীর দেখে জেনেছে । দু'একটা ছবি আঁকতে ওর মনে হলো—বাঃ এত সুন্দর নানারকম রং—যদি এ রং ওর গায়ে দেওয়া যায় কেমন দেখায় ? যেই ভাবা অমনি কাজ, তুলিতে রং নিয়ে গায়ে দু'চার বার টেনে—আয়নায় গিয়ে দেখে খুব ভাল লাগলো—তারপর মনে হল এই সেদিন মুনকী অত সুন্দর করে চান করিয়ে দিয়েছে—সে দেখলে যদি রাগ করে—? ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ট্রিংকা । রং তুলি সব রেখে নিজের জায়গায় চলে গেল । ওর নতুন চেহারা যারা দেখলো তারাই খুব হাসতে লাগলো ।

কিন্তু ট্রিংকার তখন ভয় ঢুকেছে বলে আর কিছু বল্লে না । পড়বি তো পড় মার চোখে পড়লো ট্রিংকার ঐ অপরূপ চেহারা । আবার মুনকী বকুনী খেল—কিন্তু রাগ করে মুনকী ট্রিংকার গায়ে হাত দিল না—মনে ভাবলো আবার ছুটি আসুক তখন হবে ।



এদিকে ট্রিংকার যা অবস্থা, রংগুলো শুকিয়ে চড়চড় করছে, ধুলো ময়লা পড়েছে অথচ মুনকী যে সেই মাসীর বাড়ী কুইনস্ পার্কে গেছে ফিরবার নাম নেই।

কিছুদিন কাটলো, মাসীর বাড়ী থেকে পরীক্ষা দিয়ে মুনকী ফিরে এলো। খেলাঘরের সঙ্গীরা সবাই ট্রিংকাকে দেখে হাসাহাসি করে। বলে আহা! কি অপরূপ চেহারাই না হয়েছে।

ট্রিংকা মনে মনে রেগে ফুলে ওঠে কিন্তু করবারই বা কি আছে?

মুনকী সেদিন আবার ট্রিংকাকে নিয়ে পড়লো। সাবান জলে বেসিনের মধ্যে ফেলে কষে ঘষতে আরম্ভ করলো। আবার উঁ-উঁ-উঁ করে কাঁদতে লাগলো ট্রিংকা–কিন্তু কেই বা শুনছে তার কান্না। ওকে চান করিয়ে–দুপুরের রোদে বসিয়ে রেখে দিলে মুনকী। ইস্–পিঠটা পুড়ে যাচ্ছে, সব ঝলসে গেল যেন–এত রোদ কেউ সহ্য করতে পারে? তবু ট্রিংকার সহ্য করতেই হবে। মুনকী বলেছে এমন সুন্দর লোমগুলো কি বিচ্ছিরি হয়ে গেছে, ধুয়ে দিয়েছি এখন রোদে শুকিয়ে যাক।

বিকেলে রোদ কমে এলে মুনকী ট্রিংকাকে তুলে নিয়ে এলো। 'উঃ একেবারে আধমরা হয়ে গেছি' ট্রিংকা ভাবলো। কিন্তু মুনকী আবার তাকে বুরুশ দিয়ে ঘষতে আরম্ভ করলে তারপর আবার পাউডার মাখালে।

মা দেখে বল্লেন ঃ ভাল্লুকটার ছিরি ফিরলো। বাব্বাঃ খেলাঘর আর বড় বড় খেলনা পুতুলগুলোর যা অবস্থা করেছ মা, এরকম থাকলে ওগুলো কি আর থাকবে?

মুনকী বল্লে ঃ দেখ না, শাদা রং ফিরিয়ে আনতে পাচ্ছি না, আবার রং লাগিয়ে দিয়েছিল কে তাও জানি না।

–হয়তো খোকা কোনও সময় ওর গায়ে ছবি এঁকেছে, যা দুষ্টু সব–মা উত্তর দিলেন।

ট্রিংকা মনে মনে হাসছে।

কয়েকদিন গেল মন্দ না। সেদিন ভয়ানক ঝগড়া বেধে গেছে–রাগটা অবশ্য ট্রিংকার উপরেই সবার। ঘোড়াটা রেগে খটমট করে তেড়ে এলো, সেপাই পুতুলটা

বন্দুক উঁচিয়ে তুললো–একটা ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র যেন। কেবল ডলি পুতুল আর তামাক-খেকো বুড়ো পুতুল এসে সবাইকে থামালো। বুড়ো বল্লে ঃ ছেলে ছোকরার কাণ্ডই আলাদা, যাও যাও সব ঘরে যাও। একজায়গায় থেকে ঝগড়া করতে আছে, হিংসে করতে আছে–যাও যাও সব মিটমাট করে ফেলো।

ডলিও বল্লে ঃ তাই তো বলছি সেই থেকে–দেখুন না জ্যাঠামশাই।

কিন্তু তখনকার মত থামলে কি হবে–রাতে সবাই যখন ঘুমোচ্ছে–তখন ট্রিংকা উঠে সোজা রান্নাঘরের দিকে গিয়ে ছোট কয়লা চারটি বেশী করে এনে রাখলো–খেলাঘর থেকে খানিকটা দূরে একটা ইজিচেয়ারের আড়ালে থেকে সেই কয়লার টুকরোগুলো ক্রমাগত ছুঁড়তে লাগল–ঘোড়া আর–সেপাই পুতুলটার গায়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ চারটি কয়লা জমে গেল আর খটখট শব্দ শুনে খেলাঘরের সবার ঘুম ভেঙে গেল। ট্রিংকা একটা করে কয়লা ফেলে আর চেয়ারের পিছনে লুকোয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই জেনে গেল একাজ কার।

কিন্তু ট্রিংকা তো দেখতে পাচ্ছে না–সে কয়লা আনতে আর ছুঁড়তে গিয়ে তার কি অবস্থা হয়েছে, কালিতে সারা দেহ ভরে গেছে। এবার ঘোড়া আর সেপাই তেড়ে গেল কেননা শেষের বারের দু'টো টুকরো এসে ডলির চোখে লেগেছে আর তামাক-খেকো বুড়োর কলকে ভেঙে গেছে। ডলি তো কান্না শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে সকাল হয়ে গেছে তাই রক্ষে–নাহলে সেদিন ট্রিংকা আর আস্ত থাকতো না–স্ক্যাম্প শুধু রেগে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল।

তারপর কোথায় ছিল কালো রং–নিয়ে এলো মুনকী, তুলি দিয়ে আগাগোড়া কালো রং করে দিলো ট্রিংকাকে। ট্রিংকা আবার কাঁদতে আরম্ভ করেছে উঁ-উঁ-উঁ করে–কিন্তু কে শুনছে ? আগাগোড়া কালো রঙে রাঙিয়ে মুনকী ট্রিংকাকে বল্লো, 'যতবার পরিষ্কার করেছি, ভালো করে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছি, ভালবেসেছি কিছুতেই তোমার পছন্দ হয়নি–কেবলই দুষ্টুমী করেছ–এখন যাও এই ভূতের মত চেহারা করে খেলাঘরে থাকগে। দলে পড়ে আরো দুষ্টু হওগে–হতচ্ছাড়া ভাল্লুক কোথাকার !' এই বলে মুনকী ট্রিংকাকে নিয়ে স্ক্যাম্প-এর পাশে বসিয়ে দিল। ওদিক থেকে ঘোড়া আর সেপাই পুতুলটা মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো।

হায় ! হায় ! যাকে সে মোটে দেখতে পারতো না, কালো বলে ঘেন্না করতো তার কাছেই এখন ওকে থাকতে হবে ?

কিন্তু এখন আর কি হবে–'যেমন কর্ম তেমনি ফল।'

ইচ্ছাপূরণ



দিদু যে চমৎকার কার্ড বোর্ডের পুতুলের বাড়ীটা জবাকে দিয়েছেন সেটা যেমনি বড় তেমনি দেখতে সুন্দর । টেবিলে রাখা যায় না । শোবার ঘরের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বাড়ীটা জবা রাখলো । মা তাঁর মাকে বললেন ঃ তোমার আদরের জন্যে আমার ঘরে আর জায়গা হবে না, জবাও ঐ নিয়ে থাকবে আর বইপত্তরে টেবিলে ধূলো জমবে ।

দিদু হাসলেন ।

সত্যি দিদুর পছন্দ আছে । এত বড় বাড়ী জবা দেখেনি—বন্ধুরা সবাই বলে ঃ পুতুলের বাড়ী না মানুষ থাকবার বাড়ী । রত্না, চন্দ্রা, কচি, কৃষ্ণা, পদ্মার মত ছোট ছোট মেয়েরা অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে । দিদু তো শুধু বাড়ীটা দেননি—একেবারে সাজানো বাড়ী । টেবিল, চেয়ার, সোফা দিয়ে সারা বাড়ীটি পরিপাটি করে সাজানো । শোবার ঘরে পালঙ্কের উপর বিছানাটি পর্যন্ত পাতা । কোথাও খুঁত নেই । জবা দেখে আর ভাবে সত্যি দিদুর খুব বুদ্ধি ।

পুরোনো, নতুন সব পুতুল ছেলে মেয়ে জীবজন্তু মিলিয়ে এক বাড়ী ভর্তি । জায়গার তো আর অকুলান নেই—ভাড়াটে বাড়ীও নয়, ফ্ল্যাটের বাড়ীও নয়—তাই হেসে খেলে ঘুরে ফিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছাতে বেড়িয়ে পুতুলদের দিন খুব ভাল করে কেটে যেতো । মনের সুখে তারা থাকতো ।

কিন্তু তারা মনের সুখে থাকলেও কিছুদিন থেকে জবার মনে সুখ নেই। কিছুতেই সে পাঁচসিকে পয়সা জমাতে পারছে না। যা দু'চার আনা পাওয়া যায়–স্কুল থেকে ফিরলে আর থাকে না। একটাকা চার আনা হলে তবে তো পাঁচসিকে হবে–। আর এই পাঁচসিকে হলে তবে একগজ লাল টুকটুকে কাপড় আসবে–আর সেই কাপড় দিয়ে বাড়ীর সব ঘরের জানলার আর দরজার পরদা হবে। যতক্ষণ না পরদা লাগানো যাচ্ছে ততক্ষণ ঘরের দরজা জানলাগুলো কেমন খালি খালি দেখাচ্ছে আর পুতুল ছেলেমেয়েদের কারুর আবরু থাকছে না। এই সব ভেবে জবার মনে অশান্তির শেষ নেই। খেলাঘরে যখন সে খেলা করতে বসে আপন মনে কতবার যে বলে এই কথা তার ঠিক নেই। মেরী অর্থাৎ খেলাঘরের বড় ডলি নিজের কানে একথা শুনেছে আর যারা আছে তাদেরও শুনিয়েছে। কিন্তু শুনেছে বটে আর জবার জন্যে তাদের মনে দুঃখ হচ্ছে তবে কিছুই করতে পারছে না।

অনেক চেষ্টা করেও জবা পাঁচসিকে জমাতে পারছে না। তাই লাল পরদা লাগানোর সখও মিটছে না।

সেদিন রাতে পুতুলদের বাড়ী সকাল হয়েছে। টেবিলে সব গোল হয়ে বসে চা খাওয়া হচ্ছে। মেরী টিপট নিয়ে সকলকে চা ঢেলে দিচ্ছে, তাকে সাহায্য করছে অন্য পুতুলরা। সবাইকে খাবার দেওয়া হচ্ছে এমন সময় ব্যাঙ কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে এসে একগোছা লেটুস শাক ফেলে দিয়ে বল্লে ঃ ক্ষুদে খরগোসটি কোথায় গেল, কাল সারারাত জ্বালিয়েছে বলে লেটুস পাতা আনে না মেসো তাই বড় খাবার কষ্ট। সেকথা শুনেই ভোর না হতেই গিয়েছিলাম–গেল কোথায় সে ? এখন চা দিয়ে খাক।

সকলের শেষে একটা ছোট চেয়ারে খরগোস বসে ছিল। লাল পুঁতির চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে উঠলো। মেরী বল্লে ঃ সাড়া দিচ্ছ না কেন ? মেসো যে সাত সকালে গিয়ে যোগাড় করে নিয়ে এলো তোমার জন্য, তা দেখেছ ? এত কষ্ট করেছে মেসো, দাও–ওকে দু'কাপ চা।

খরগোস লাফ দিয়ে ব্যাঙের কাছে এলো–বল্লে ঃ কি চমৎকার টাটকা পাতা মেসো–খুব ভালো লাগবে খেতে।

ভাল্লুক বাধা দিয়ে বল্লে ঃ ওসব কথা থাক–চা খেতে খেতে আমাদের মিটিংটা সেরে ফেলা যাক। মেরী বলছিল জবার মনে কি দুঃখ, আমরা তার যত্নের পুতুল–দেখি আমরা তার দুঃখ দূর করতে পারি কিনা।

মেরী বল্লে ঃ কাজটা একটু শক্ত, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ? দোলন ঘোড়াটা ঘরের বাইরে ছিল, কথাটা কানে যেতেই বল্লে ঃ ঠিক, ঠিক, ভাল্লুকদা আমাদের

দেখা উচিত বই কি ? বল কার দ্বারা কি হবে, যেমন করে হোক মেরীর ইচ্ছাপূর্ণ করে ফেলতে হবে ।

খরগোস লেটুস পাতা চিবোচ্ছিল, বল্লে ঃ আমায় যা বলবে তাই করবো । হাতী বল্লে ঃ তাহলে ব্যাপারটা কি বল সবাই তো কাজ করবার জন্য প্রস্তুত দেখতে পাচ্ছি ।

মেরী চায়ের টিপট রেখে নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বল্লে ঃ জবার খুব ইচ্ছা এই বাড়ীর দরজা জানলায় পরদা লাগায়—আর সেই পরদার কাপড় হবে লাল টুকটুকে । কিন্তু ওর হাতে এখন মোটে পয়সা নেই । দু'চার আনা যা জমেছিল স্কুলে খরচ হয়ে গেছে—আর এখন চাইলেও মা দেবেন না । তাই মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

হাতী বল্লে ঃ তাহলে কোনো উপায় নেই । মানুষদের এই পয়সা টয়সার ধার ধারি না আমরা, কাজেই ওর কোনো ব্যবস্থা করতে পারবো না ।

ভাল্লুক বল্লে ঃ একটু ভেবে দেখো না, আগে থেকেই সটান না বলে দেওয়া ভালো নয় ।

জরীপাড় শাড়ী পরা বৌ পুতুল বল্লে ঃ মেরী, অত ভাবনার কি আছে, পরদা কি আমরা সেলাই করতে জানি না—করে দেবো ।

—আরে না, না তা নয়, সেলাই করতে জানি তো নিশ্চই—কথা হচ্ছে কাপড়টা পাবো কোথায় ? ওর তো লাল টুকটুকে কাপড় চাই—যার জন্য পাঁচ সিকে পয়সা ওর দরকার হচ্ছে ।

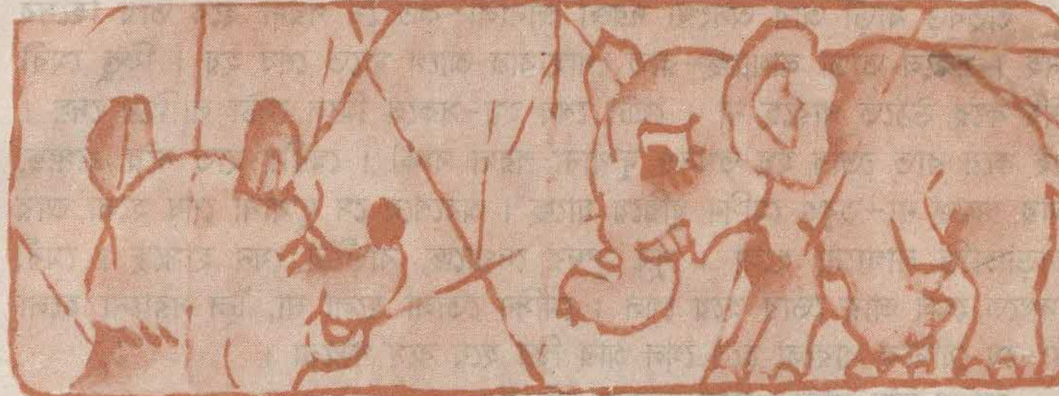
—তাই তো, কি করা যায়—ভাল্লুক মাথা চুলকে বললে । খরগোস এতক্ষণ লেটুস পাতার গোছা নিয়ে জানলার ওপর উঠে রাস্তার দিকে তাকিয়ে পা দুলিয়ে খাচ্ছিল । একটু পরে বল্লে ঃ আচ্ছা মেরীদি, ঐ যে ফটকের উপর একটা লতানো পাতাবাহার গাছ উঠেছে—ঐ লালটুকটুকে পাতাগুলো নিয়ে এলে পরদা হয় না ?

হাতী বল্লে ঃ বাঃ রে—ছোকরার বুদ্ধি আছে । ঠিক হয়েছে, মানুষদের মত আমাদের যখন পয়সা কড়ি নেই তখন এ বুদ্ধি খুব চমৎকার ।

সবাই জানলা দিয়ে দূরে তাকালো যেখানে লাল পাতাবাহার গাছ আরম্ভ হয়েছে ।

ব্যাঙ বল্লে ঃ এখানে তো বেশী নেই, আর একটু দূরে মাইলখানেক গেলে লালপাতা গাছের ঝাড় রয়েছে ইচ্ছা হলে সেখান থেকেও আনতে পারো । লেটুস পাতার খোঁজে গিয়ে আমি দেখেছি ।

সকলেই একমত হয়ে বল্লে ঃ ঠিক আছে, ঐ পাতাবাহার লালপাতা সেলাই করে পরদা হবে জবার আর দুঃখ থাকবে না ।



হাতী বল্লে ঃ জবাকে যে আমরা ভালবাসি সেকথা সেও বুঝবে ।

ভাল্লুক বল্লে ঃ তাহলে মেরী সেলাই করছো তো ?

মেরী বল্লে ঃ হ্যাঁ, এই তো সেদিন জবা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে প্লাস্টিকের নতুন সেলাই মেসিন কিনেছে—ওটাতেই আমি বেশ সেলাই করতে পারবো । আর বৌ-পুতুল তুমি আজ ঘরকন্নার কাজ ছেড়ে দিয়ে আমায় সাহায্য করবে । কেটে দেবে তুলে দেবে—না হলে তাড়াতাড়ি হবে না ।

বৌ-পুতুল তো আগেই রাজী হয়েছিল ।

এখন পাতা আনতে যেতে হবে । কে যাবে ? হাতী গেলে তোমার গাছপালা ভেঙে নষ্ট করে দেবে । ঐ পায়ের চাপ লাগলে আর কিছু থাকবে না । ভাল্লুক চায়ের কাপ রেখে সবেমাত্র খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে । ব্যাঙ গেলে তো হবে না—তাহলে ?

খরগোস বল্লে ঃ মেরীদি, তুমি অত ভাবছো কেন ? আমি যাবো ।

—অতটা দূরে, তুই গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ফিরবি কি করে ? রাতের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে—মেরী চিন্তিত হয়ে বল্লে ।

বৌ-পুতুল বল্লে ঃ দোলন ঘোড়ার পিঠে উঠে যাক—ছুটে যাবে ছুটে আসবে ।

তারপর দোলন ঘোড়ার পিঠে উঠলো খরগোস—আর সে প্রাণপণে দৌড়ল ।

একরাশ লালপাতা এনে ঘরের ভেতর ফেলে খরগোস বল্লে ঃ এই আশ্বিন মাসেও বিষ্টি পড়ছে—দেখো না আমার তুলোর শাদাপায়ে কাদা লেপে গেল—আর দোলন ঘোড়ার পায়েও লাগলো ।

মেরী বল্লে ঃ যা হয় করে পরিষ্কার কর বাপু—আমি এখন সেলাই করতে বসি । এই বলে মেরী মেসিন বার করে জোরে জোরে চালাতে লাগলো আর বৌ পুতুল তাকে হাতে হাতে জুগিয়ে দিতে লাগলো ।

অতবড় বাড়ী আর অসংখ্য দরজা জানালা–কত যে পরদা হবে তার হিসেব নেই। সকলে তাড়া লাগাচ্ছে–রাত পোহাবার আগে যাতে শেষ হয়। কিন্তু মেরী শেষ করে উঠতে পারছে না। যেটা শেষ হয়–সকলে মিলে সেটা লাগিয়ে দেয়। এই করে রাত ভোর হয় তখনও দু'খানা পরদা বাকী। মেরীর হাত ধরে এসেছে, আর চলছে না–তবুও মেসিন ঘুরিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে সে দু'খানা শেষ হলো আর তাড়াতাড়ি লাগানো হলো। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, বাড়ীটা যেন হাসছে। মেরী দেখতে গেল আর ভোর হয়ে গেল। মেসিন তোলা হলো না, টুল সরানো হলো না–যে যেদিকে পারলো চলে গেল আর স্থির হয়ে বসে পড়লো।

সকাল হয়ে গেছে। কাক ডাকছে বাইরে।

একটু বেলা হলে জবা খেলাঘরে এসে অবাক–এত সুন্দর সুন্দর পরদা করে টাঙ্গালো কে? দু'বার তিনবার দেখলো–সত্যি খুব ভালো হয়েছে। তারপর পুতুলগুলোর দিকে চেয়ে দেখলো মনে হলো ওরা যেন খুশী মনে হাসছে।

জবা অনেকক্ষণ ভাবলো–তারপর দেখলো সেলাই-এর মেসিনটা বাইরে রয়েছে, তারপর দোলন ঘোড়ার পায়ে কাদা লাগা। ব্যাপার কি হলো বুঝতে না পেরে–সকাল বেলা পড়ালেখা ছেড়ে সে পাশের বাড়ী শীলার কাছে গেল। শীলা তার বন্ধু–যদি সে কিছু জানে তাহলে বলবে।

কিন্তু পুতুলদের কাণ্ডর খবর কেই বা সঠিক দেবে?



এমনটি শুনেছ



নৌকা যারা চালায় তাদের আমরা মাঝি বলি, কেমন ? নাবিকও বলি, আর সে কথাটা বেশ ভাল লাগে শুনতে । এই করম একটা নাবিক-পুতুলের গল্প শোনো ।

দোকানে তোমরা নিশ্চয় দেখেছ ; কারুর কারুর খেলাঘরেও এই পুতুল আছে । পোশাকটা কি সুন্দর লাগে ! কালো বর্ডারে শাদা পোশাক, টুপিটাও কী চমৎকার !

অনেকগুলো পুতুলের সঙ্গে ঐ পুতুলটা মনুর খেলাঘরে ছিল । বেশ মোটা-সোটা চেহারা বলে মনু ওর নাম দিয়েছিল ভোম্বল সর্দার ।

সেদিন খেলাঘরে যখন কেউ ছিল না—তখন অন্য পুতুলগুলো কথা বলাবলি করছিল, এমন সময় একটা নিঃশ্বাসের শব্দ হলো । ওরা দেখলো ভোম্বল বিষণ্নমুখে জোরে নিঃশ্বাস ফেললে ।

পুতুলদের ভিতর গিন্নি-বান্নি হলো, মাটির ধেবড়া চেহারা—নাকে-কানে পুঁতির মাকড়ী-দেওয়া বেনে-বৌ পুতুল । সে জিজ্ঞাসা করলো—কে অমন নিঃশ্বাস ফেলল রে ? ভোম্বল সর্দার বুঝি ? কেন ওর কি হয়েছে ?

–বল কি মাসী কি হয়েছে ! কি হয়নি তাই বলো ?

অন্য সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো–কেন ? কেন ?

–আমার দুঃখ কেন, জানো না ? কতদিন এখানে এসেছি বল ত ? মাঝে মাঝে মনু এক-আধবার নামিয়ে খেলা করে, তা না হলে ঘরের মধ্যে ঠায় বসে আছি। অথচ আমি কোথায় সমুদ্রে যাবো, গঙ্গায় নামবো, বড় বড় নৌকো-জাহাজ তদারক করবো–তা না জলের মুখ দেখলাম না, ঘরেই বসে রইলাম। আমার টুপির লেখাটা পড়েছ, কি লেখা আছে ? আর আমার কি না জাহাজ তো নেই-ই, একখানা নৌকা পর্যন্ত নেই !

খরগোস পুতুল বল্লে–সত্যি কথাই, তাছাড়া আজকাল মনুও আমাদের বেশী ভালোবাসে না। নতুন একটা পুতুল পেয়েছে, কেবল বলে এই পুতুলটা খুব সুন্দর। বুঝতে পারছি তোমার সময় খুব খারাপ।

ভোম্বল সর্দার আবার নিঃশ্বাস ফেললে।

–সত্যি তোমার সময়টা খুব খারাপ। সমবেদনার সুরে হাতীও বলে উঠলো।

হঠাৎ খরগোস বল্লে–দেখ দেখ ভোম্বল সর্দার, কি যেন আসছে !

খরগোসের কথা শেষ হওয়া মাত্র জানালা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকলো–এক রাশ ফুলঝুরির মত নানা রং-এর ফুল ছড়িয়ে !

–আরে এ কি ?

সকলে চেয়ে দেখলো–ঝকঝকে সুন্দর পোশাক পরা একটা ফুটফুটে পরী–নীল পাখা দু'টো তখনও কাঁপছে !

–তোমরা কেউ আমায় একটু সাহায্য করতে পারো ?–গোলাপের পাপড়ির মত লাল ঠোঁট দু'টি নড়ে উঠলো, পরী বল্লে।

–কি সাহায্য বল ? তার আগে বল তুমি কে ? –পুতুলরা জিজ্ঞাসা করলো।

–আমি ভাই পরী, বোনকে সঙ্গে করে আসছিলাম উড়তে উড়তে, একটা বড় গাছে বোনের জামাটা আটকে গেল। নীচেই নদী ছিল–ঝপাৎ করে পড়ে গেল সেই নদীর জলে ! হাবুডুবু খাচ্ছে, উঠতে পারছে না ! কিছু করতে পারলাম না আমি, তাই তোমাদের কাছে এলুম–পারবে কেউ সাহায্য করতে ?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে–কে সাঁতার জানে ?

হঠাৎ ভোম্বল সর্দার দুই লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো–হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পারবো। কোথায় তোমার বোন ? চল চল।

খরগোস বল্লে–তাইতো আমাদের ভোম্বল সর্দার থাকতে এত ভাবনার কি আছে ? যাও হে ভোম্বল সর্দার !

—আচ্ছা ক'দিন আগে মনু যে একখানা নৌকো কিনে এনেছিল খেলাঘরে, কই বলো তো সেটা ?

ভোম্বল সর্দার একথা বলার পর সকলেরই মনে হলো তাই তো, সেদিন মনু যে এনেছিল একখানা টিনের নৌকো !

এদিক-ওদিক তোলপাড় করে পাওয়া গেলো সেখানা, আর সবাই মিলে ধরাধরি করে জানালা গলিয়ে নৌকোটা নীচে ফেলে দেওয়া মাত্রই ভোম্বল লাফিয়ে পড়লো নীচে। এদিকে পরীও আগে আগে চলেছে পথ দেখিয়ে, কাজেই নদীর কাছে এসে পৌঁছুতে একটুও দেরী হলো না।

নীলপরী ভোম্বল সর্দারকে বল্লে—ঐ দেখো আমার বোন জোনাকী হাবুডুবু খাচ্ছে, এখ্‌খুনী ডুবে যাবে ! তুমি শীগগির নৌকো বেয়ে চলো।

ভোম্বল সর্দার এর আগে নৌকো বেয়ে চলে নি—তাই খুব তাড়াতাড়ি চালাতে পারছিল না, যাই হোক কোন রকমে ঠেলে ঠুলে গিয়ে জোনাকীর কাছে পৌঁছুল।

জোনাকীকে নৌকোয় উঠিয়ে ভোম্বল সর্দার ভাবলে, আমি খুব ভাল নাবিক তা বোঝা যাচ্ছে। না হলে একে কেমন করে উদ্ধার করলাম এই জল থেকে।

কিন্তু ভোম্বল সর্দারও ভিজে টুপটুপে হয়ে গেছে আর হাঁফিয়ে উঠেছে। বাড়ী থেকে আসা পর্যন্ত কম কসরৎ করতে হয়েছে তাকে ?

দু'জনেই তখন চুপ করে জিরিয়ে নিতে লাগল।

কিন্তু জোনাকীর দিদি কোথায় গেল ? কোথাও সে নেই দেখে ভোম্বল সর্দার বল্লে—তোমায় এখন কোন দিকে নিয়ে যাবো বলো, পৌঁছে দিচ্ছি।

ভোম্বল কথাটা বল্লে বটে কিন্তু এতক্ষণ এত লাফালাফি করে ওর গায়ে যেন আর শক্তি নেই ! হাল যেন সে আর টানতে পারছে না, অথচ বাতাসে আর স্রোতে নৌকো বেশ চলতে শুরু করেছে।

জোনাকী এতক্ষণে একটু শান্ত হয়েছে ; বল্লে ঃ দেখছো তো নৌকো আপনিই চলেছে, চলুক—যদি দরকার হয় পরে বলবো।

ভোম্বল বললে ঃ তোমার বাড়ী যেখানে, সেখানে তো তুমি যাবে, না নৌকো যেদিকে যাবে সেদিকে যাবে ? আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুমি ? তোমার দিদিটিই বা কোথায় গেলেন ?

—দিদির তো আমার মত জামা-কাপড় ভিজে যায় নি, আর জলে পড়ে হাবুডুবুও খায় নি—তাই দিদি আকাশে উড়ে সোজা বাড়ী চলে গেছে।

—আমাদের তো যেতে হবে ?

—তুমি চুপ করে বসো না,—তুমিও তো আমার মত জামাকাপড়ের পদার্থ



রাখনি।

ভোম্বল একবার তার ভিজে পোশাকের দিকে তাকালো, তারপর নৌকোর ভিতর চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আকাশে দু'চারটে তারা ফুটেছে, ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে, এক ফালি চাঁদও দেখা যায় মেঘের ফাঁকে।

বেশ লাগছে ভোম্বল সর্দারের—কেমন শান্ত নির্জন পরিবেশ! তবে বন্ধুদের জন্য মন কেমন করে বৈ কি! এতদিন এক সঙ্গে থেকে হঠাৎ চলে আসা! বৌ-পুতুল তাকে খুব ভালবাসতো—বাচ্চা খরগোসটা রোজ গল্প শুনতে আসতো। হাতীভায়া কতদিন যে খোস মেজাজে গল্প করেছে—সকলে যেন সকলের কত আপনার লোক! সন্ধ্যা হলো এখন সব নিজেদের ঘরে গল্প করছে, ভোম্বলের কথাও ভাবছে নিশ্চয়। একটা যদি খবর দেওয়া যেতে পারতো!

এই সব একমনে ভেবে চলেছে ভোম্বল সর্দার। হঠাৎ জোনাকী ডাকলো—দেখ, দেখ, ঐ যে আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, আমরা এসে পড়েছি আর কি!

ভোম্বল তাকিয়ে দেখলো কী সুন্দর জায়গাতেই না এসে পড়েছে তারা! চাঁদের আলো আকাশ-মাটি ভরিয়ে দিয়েছে! নদীর পাড় ঝকমক করছে আর নদীর ওপারেই জোনাকীদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন হীরা, মুক্তা, চুণি, পান্না দিয়ে গাঁথা বাড়ীটা যেমন উজ্জ্বল তেমনি চমৎকার! বাড়ীর মাথার লম্বা চূড়াটি দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

অবাক হয়ে দেখতে দেখতে ভোম্বল বল্লে ঃ এ দেশের নাম কি? এমন সুন্দর দেশ!

—এর নাম হলো পরীদের রাজ্য।

—আমি কখনও ভাবতেই পারি নি—এমন ভালো জায়গা আছে, এত সুন্দর বাড়ীঘর আছে!

জোনাকী হেসে বল্লে ঃ তুমি ভাববে কি করে, নাবিক হয়েছ অথচ নৌকো বা জাহাজে ওঠোনি ! কবে দোকানে এসেছিলে তারপর মনুর খেলাঘরে বন্দী হয়ে আছ ! দেখছো তো মনুর খেলাঘরের চাইতে কত ভালো আর সুন্দর জায়গা আছে ?

—হ্যাঁ দেখলাম, তাই ধন্যবাদ তোমায় । তোমরা এ রকম জায়গায় থাক, কত যে আনন্দে আছ বুঝতে পারছি।

জোনাকী বল্লে ঃ নেমে এসো, তীরে এসে গেছি । ঐ দেখো বাড়ী, কিন্তু বড্ড রাত হয়ে গেল ভোম্বল ! কত বড় চাঁদ উঠেছে দেখ না আকাশের মাঝখানে ! আমাদের তো ঘড়ি নেই, আমরা চাঁদ দেখেই সময় ঠিক করি । এসো আমার সঙ্গে ।

নৌকোটিকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধলো ভোম্বল—তীরে উঠে । তারপর দু'জনে হলদে রং-এর বাড়ীটায় গিয়ে ঢুকলো । সামনের ঘরে ঢুকে ভোম্বলের কিন্তু মনে হচ্ছিল ঘর আর বাইরে কোনও তফাৎ নেই । বাইরে যেমন স্নিগ্ধ নরম আলো ছিল তেমনই ঘরের আলো ! জানালা-দরজায় সব নীল পর্দা ঝোলান ।

একটা কৌচের উপর বসে পড়লো দু'জনে—তারপর জোনাকী বল্লে ঃ তোমার খেলাঘরের জন্য মন-কেমন করছে না তো ?

—না, না, মোটেই না । মন-কেমন করা সেটা মেয়েদের জন্য—পুরুষ মানুষের আবার মন-কেমন কি ?

জোনাকী তার মুক্তোর মত শাদা আর ছোট ছোট দাঁতগুলি দিয়ে ঝিকমিক করে হেসে উঠলো ।

—আচ্ছা তোমার শীত করছে নাকি ভিজে কাপড়ে ? এক কাজ করো—জামা-কাপড়গুলো বদলে বসো, আমি আসছি । ঐ দেখ এই আলমারীতে অনেক কাপড়-জামা আছে ।

জোনাকী চলে গেল আর ভোম্বল চট করে তার পোশাক বদলে সেগুলো নিঙড়ে মেলে দিয়ে চুল আঁচড়ে মুখ মুছে ভালো করে বসলো ।

জোনাকীও পোশাক বদলে এসেছে, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তাকে ! পিছনের নীল পাখা দু'টোয় যেন ওকে আরো সুন্দর দেখায় !

—এসো ভোম্বল, একটু কফি খাও ! তুমি আবার সায়েব মানুষ । এই নাও চকোলেট আর বিস্কুট ।

ভোম্বল বললে ঃ আর তুমি ? জোনাকী হেসে উত্তর দিল ঃ আমরা ফুলের গন্ধ খেয়ে বেঁচে থাকি । কফি, বিস্কুট তো চলবে না ভাই !

অগত্যা ভোম্বল খেতে লাগলো আর গল্প করতে লাগলো ।

কতক্ষণ বাদে ভোম্বল বললে ঃ ঘুম আসছে, কত রাত হলো বলতো !

—ও হো অনেক রাত হয়েছে, তুমি ঘুমোও, আবার কাল সকালে দেখা হবে। জোনাকী একথা বলে চলে গেল, আর ভোম্বল গায়ে চাপা দিয়ে খুব ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে উঠেই ভোম্বল তার নিজের জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিল। একটু পরেই জোনাকী এলো, সকালে চা-খাবার বেশ করে খেয়েদেয়ে ভোম্বল বললে ঃ আমি ভাবছিলাম এবার আমি বাড়ী ফিরবো, কিন্তু কি করে ফিরবো বলতো ?

—না, না, তা মোটেই হবে না, ফিরে যেতে দেবো না। তুমি তো আমাদের বন্ধু ভাই ভোম্বল ! তুমি এখানেই থাকবে, মাকে বলে তোমার দু'টো পাখা করে দেওয়াবো, তুমি আমাদের এই নদীর নাবিক হয়ে তোমার নৌকো নিয়ে এপার-ওপার করাবে—কেমন ?

—আমার নৌকোয় উঠবে কে ?

—সব্বাই উঠবে। জানো আমার মা হলো এ রাজ্যের রাঁনি। মা কাল আমায় এ কথা বলেছে ! মা যা বলবে তাই হবে কিনা এখানে। কেন তুমি এখানে থাকতে চাও না ? আর এই নাবিকের কাজ পছন্দ করো না ?

—নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই !—চেঁচিয়ে উঠলো ভোম্বল সর্দার।

ভোম্বল সর্দার এই তো চেয়েছিল ! তাই সে খুশী মনে ভাল ভাল পোশাক পরে নতুন ছোট্ট নৌকোখানা নিয়ে রোজ নদীর এপার-ওপার করে। তার এখন চমৎকার দু'টো নীল পাখা হয়েছে।

জোনাকী তার খুব বন্ধু। রোজ বিকেলে জোনাকীকে নিয়ে সে নদীতে বেড়িয়ে আসে। জোনাকী বলে ঃ তুমি যখন ভয় পাবে আমাকে ডেকো। অন্ধকার রাতে আমার চেহারা দেখতে না পেলেও দেখবে ছোট ছোট পোকার মত আলো জ্বলছে আর নিভছে। তখন মনে করবে আমি তোমার কাছেই আছি, ভয় পেয়ো না !—অন্ধকার রাতে আমরা ফুলের মধু খেতে বার হই কি না !

ভোম্বল সর্দারকে দেখলে আর চেনাই যায় না—এমনি সুন্দর চেহারা হয়েছে তার ! মাঝে মাঝে তার খেলাঘরের কথা মনে পড়ে—কিন্তু সে তো একদিন এই রকমই চেয়েছিল ! তাই তার মনটা খুব খুশী আছে।

মনু মাঝে মাঝে ভাবে, আচ্ছা ! পুতুলটা গেল কোথায় ? কেউ চুরি করে নিল নাকি ?

ক্যাপ্টেন আর ডলির কাহিনী



বিছানায় শুয়ে মুক্তি ফোঁপাতে আরম্ভ করলো। রাগে দুঃখে তার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। এত বকুনী মিছিমিছি খেতে হলো মায়ের কাছ থেকে। পড়া নেই শোনা নেই, কেবল খেলা আর খেলা—মুক্তি পড়া করে নি ? এইসব মা বললেন। কেঁদে কেঁদে মুক্তির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো, পাশেই তার বড় লাল ডলিটা শুয়ে ছিল—এ পুতুলটাই মুক্তির সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দের। তার দিকে তাকাতেই মুক্তি জ্বলে উঠলো—এদের জন্যই এত বকুনী। যেই না মনে হওয়া অমনি ডলিকে নিয়ে জোরে ছুঁড়ে ঘরের কোণের দিকে ফেললো। ডলি সেখানে উপুড় হয়ে গিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু কেই বা তার চীৎকার শুনছে—ডলি তেমনি মুখ থুবড়ে পড়ে কতরাতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে মুক্তি দেখলো ঝি এসে তার ঘুমন্ত ছোট ভাই বাবুয়াকে তার পাশে শুইয়ে দিয়ে গেল। বাবুয়াও খুব বকুনী খেয়েছে, সেও নাকি পড়া করে না।

মুক্তি বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে আবার ফোঁপাতে লাগলো, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লো—তা সে জানে না।

এদিকে মুখ থুবড়ে ডলি এতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে পাশ ফিরবার চেষ্টা করলো। উঃ সারা শরীরে তার কি যন্ত্রণা, নাকটা তো একদম থেঁতলে গেছে। কি হবে তার আর এই কোঁকড়ান কালো চুল, বড় চোখ, এত সাজ পোশাক ! এই সুন্দর মুখে যদি নাকটাই না রইল তা'হলে আর কি দরকার বেঁচে থেকে—সবাই তো আর ডলি বলে

ডাকবে না–বলবে খাঁদা, খেঁদি ! সে কি সহ্য করতে পারা যায় ?

ডলি কষ্ট করে পাশ ফিরতে গিয়েই কার সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগলো । ডলি জোরে 'আঃ' বলে উঠলো !

–কি হয়েছে তোমার, তখন থেকে কাতরাচ্ছ ? কে বলে উঠলো !

–কে ? ও ক্যাপ্টেন ! দেখছো না–আমার কী অবস্থা ?

ডলি যার সঙ্গে কথা বললো সে হলো খেলাঘরের ক্যাপ্টেন পুতুল, তার আশে পাশে বহু সেপাই পুতুল আছে–তাদের সে চালনা করে । কিন্তু কিছুদিন থেকে তারও দুর্গতির শেষ নেই । বাবুয়া তাদের নিয়ে খেলতে খেলতে–তাদের যত রকম পারে কষ্ট দিয়েছে ।

ক্যাপ্টেন বল্লে,–দুই ভাইবোনই সমান, কার কথা বলবো বল ? চল আগে তোমার প্রাথমিক চিকিৎসা করি । চল ঐ ওখানে, হ্যাঁ, এই খাটিয়াটায় একটু শোও,–নাকটা দেখি–দাঁড়াও ওষুধ দিই । আচ্ছা এবার এটা খেয়ে ফেলো তো ডলি । ক্যাপ্টেন-এর কথামত সব করে ডলি খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলো ।

তারপর ক্যাপ্টেন বললে,–এখন কেমন ভালো মনে হচ্ছে তো ডলি ?

–হ্যাঁ অনেক ভালো, তোমাকেও ধন্যবাদ । কিন্তু নাকটা নিয়ে কি হবে ক্যাপ্টেন ? ডলি বললে ।

ক্যাপ্টেন বললে, কি বলবো বল–ওরা ভাইবোনে যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে তাতে আর বেঁচে থাকার উপায় নেই । তুমি কাঁদছো মুক্তি ছুঁড়ে ফেলেছে বলে, আর বাবুয়া আমায় কি করেছে জানো ? আমার দু'পাশে যত সেপাই ছিল সবগুলোর হাড়গোড় ভেঙেছে–অবশিষ্ট যা দু' একটি আছে আমি তাই দিয়েই কাজ চালাই, আর আমার দশা দেখ–সেদিন পায়ের চাপ দিয়ে আমায় তো চেপ্টে ফেলবার যোগাড়, আমি চিৎকার করছি তা সেদিকে দেখেও না, শোনেও না । শেষে কে যেন এলো– তখন আমায় ছেড়ে দিল । মনে কর এরকম অত্যাচার কি সহ্য করা যায় ?

ডলি বললে,–বুঝতে তো পাচ্ছি ক্যাপ্টেন, আমাদের কষ্টের দিকে ওদের লক্ষ্য নেই । কিন্তু জানে না তো–আমিও আগে মুক্তির মত মানুষ ছিলাম–ঐ রকম সুন্দর ফ্রক পরে রিবন বেঁধে স্কুলে যেতাম, খেলাধূলোকরতাম ! আমারও ঘরভর্তি সাজানো খেলাঘর ছিল । আমি একদিন রাগ করে পুতুল ভেঙেছিলাম বলে ভগবান বলেছিলেন, পুতুলের কষ্ট বোঝ না, তোমার শাস্তি হবে–তুমি এখনি পুতুল হয়ে যাও । ওমা ! বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুতুল হয়ে গেলাম । আমি খুব কাঁদতে লাগলাম । তখন ভগবান বললেন,–আচ্ছা তুমি যার পুতুল হয়ে যাবে সে যদি দুষ্টু মেয়ে হয় সে যতদিন না ভালো হবে ততদিন তুমি এমনি থাকবে, আর সে যেদিন ভালো হবে,



তোমারও পুতুল-জন্ম উদ্ধার হবে ।

ডলিকে সান্ত্বনা দিয়ে ক্যাপ্টেন বললে,–তুমি শুধুই নিজের কথা ভাবছো ডলি, আমার কথা মনে করছ না, বাবুয়ার অত্যাচারের কাহিনী যদি সব বলি তুমি অবাক হয়ে যাবে । আমি রোজ সকালে উঠে প্রার্থনা করি আমার পুতুল-জন্ম উদ্ধার হোক, বাবুয়ার হাত থেকে বাঁচি ।

–তাই ন্যাকি ? আমিও তাহলে সকালে উঠে প্রার্থনা করবো, মুক্তির অনাদর আর সহ্য হয় না ।

সেদিন রাত্রি থেকে মুক্তি প্রতিজ্ঞা করেছে আর সে দুষ্টুমী করবে না, দুষ্টুমী না করলে বকুনীও খেতে হবে না । রোজ রাত্রে শোবার সময় এই কথা বাবুয়াকে সে বোঝায়–বাবুয়াও দিদির কথা শোনবার চেষ্টা করে ।

সেদিন রাত্রে শুয়ে আধ ঘুমের মধ্যে মুক্তি আর বাবুয়া দুজনেই শুনতে পেলো মা বাবাকে বলছেন,–মুক্তি আর বাবুয়া দুজনেই খুব লক্ষ্মী হয়েছে, সেই সেদিন বকুনী খেয়েছিল–তারপর !

বাবা বললেন,–তাই নাকি ? তা হলে চল কাল মুক্তির জন্মদিন, মার্কেটে গিয়ে নতুন নতুন খেলনা পুতুল মুক্তি আর বাবুয়ার জন্য কিনে আনি ।

জন্মদিনের আনন্দ আর প্রচুর খেলনা পুতুল, রেল, ট্রাম, মোটর গাড়ি ইত্যাদি পেয়ে মুক্তি আর বাবুয়ার আনন্দ ধরে না । নতুন খেলনা আসার পর যত রাজ্যের পুরোনো খেলনা ছিল ঝুড়ি ভর্তি করে চাকরবা সেগুলো বাইরে ফেলে দিল ।

মুক্তি আর বাবুয়া আর কোন দিন দুষ্টুমী করে নি । আর ও বাড়ির দরজার বাইরে গিয়ে ডলি আর ক্যাপ্টেন পুতুল-জন্ম থেকে উদ্ধার পেলো ।

টিটুন



টিটুনের যেমন ফোলা ফোলা সুন্দর চেহারা—আবার একটা নীল রং-এর রিবন বাঁধা—সেইজন্য তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে, যেই তাকে আদর করবে অমনি তার চোখদুটো আরও চকচক করে উঠবে।

টিটুন হলো রীতার সব চেয়ে আদরের পুতুল খরগোস।

তার যত খেলনা পুতুল আছে তার মধ্যে টিটুনকে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। একমাত্র স্কুলে যাওয়া ছাড়া সে সব সময় টিটুনকে সঙ্গে রাখে। কোথাও বেড়াতে গেলেও টিটুন সঙ্গে যায়—এ নিয়ে তার বন্ধুরা তাকে কত যে ঠাট্টা তামাসা করেছে তার ঠিক নেই।

সেদিন ছোট মামীর বাড়ী তাদের নেমতন্ন। বৌবাজার থেকে বেলগেছিয়া—খুব দূর অবশ্য নয়। মা আর টিটুন তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লো, টিটুনও ছিল রীতার সঙ্গে—টিটুনেরও সাজ পোশাক বদল হলো বৈকি। রীতার চুলের রিবনের সঙ্গে তার রিবন বাঁধা হলো—একটু পাউডার মাখাও হলো।

রীতা কিন্তু সারাপথ ভাবতে ভাবতে আসছে—টিটুনকে তো নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু ছোট মামীর ছেলে দুটো বুলু আর নান্টু কি দুষ্টু যে! ওদের সঙ্গে খেলা করতে ভালো লাগে কিন্তু দুষ্টুমী সহ্য করা যায় না। চুল টেনে রিবন খুলে দিয়ে আচমকা ধাক্কা দিয়ে, জামাকাপড় নোংরা করে দিয়ে—ও আবার কি খেলা? বুলু আর নান্টু যদি আমাদের স্কুলে পড়তো দু'দিনেই এসব বদ অভ্যাস ছেড়ে যেতো। তবে খেলবার বন্ধু হিসাবে বুলু নান্টু ভারী ভালো—সেই জন্যই রীতা ওদের ভালবাসে।

ছোট মাসীর বাড়ী পৌঁছতেই তো ভারী খুশী মা আর মাসী। দুই বোনে গল্প করতে চলে গেলেন। রীতাকে নিয়ে বুলু নান্টুও বাগানে খেলতে গেল।

—ওমা তোর খরগোসটা কি সুন্দর—নান্টু বল্লে।

—দেখি দেখি—আরে পেট টিপলে প্যাঁক প্যাঁক করছে, ভারী মজা তো।

বুলু একথা বলেই জোরে দু'চারবার পেটটা টিপে দিলে। এত জোরে পেট টিপলো—রীতার মনে হলো টিটুন যেন কেঁদে চীৎকার করছে, স্বাভাবিকভাবে প্যাঁক প্যাঁক করছে না।

রীতা বল্লে ঃ অমন করে জোর দিও না বুলু—ওর লাগে, দেখছ না ওর চোখ ছলছল করছে।

হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হাসলো বুলু,—সঙ্গে নান্টুও যোগ দিল—ভারী তো একটা পুতুল ওর আবার চোখ ছলছল—হাসালে রীতা।

নান্টু বল্লে ঃ তার চেয়ে চল ঐ গাছটায় ওকে বেঁধে আমরা খেলি।

রীতা কিছু বলবার আগেই—বুলু দৌড়ে গিয়ে তাকে একটা বড় গাছের সঙ্গে লতাপাতা, গাছের ডাল পালা দিয়ে বেঁধে দিয়ে বল্লে ঃ খরগোসটা যেন চোর হয়েছে—আর আমরা ওকে শাস্তি দিচ্ছি—এই খেলাটাই বেশ।

রীতার ভালো লাগছিল না, মনে হচ্ছে টিটুন কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে বলছে তার বড্ড লাগছে। রীতা ভাবছে একটু পরে টিটুনকে মুক্তি দিয়ে ভিতরে চলে যাবে, আর খেলবে না।

কিন্তু ওমা ছোটমাসী ডাকছে দেখ—'যাই—ছোটমাসী' উত্তর দিয়ে রীতা একেবারে ছোটমাসীর কাছে হাজির।

—দেখ তোমার জন্য কি এনে রেখেছি—একটা লাল সুন্দর বাক্স ছোটমাসী রীতার হাতে দিলেন।

বাক্সটা খুলে রীতার আনন্দের সীমা নেই। নানারঙের উল, বুননের কাঁটা, নানা রং-এর সুতো, কাঁচি ইত্যাদি বুনবার সেলাই করবার সরঞ্জামে ভর্তি।

রীতা যেন অনেক ঐশ্বর্য্য পেয়েছে এই ভাবে বাক্সটা নিয়ে খুব খুশী হয়ে উঠলো।

ছোটমাসী বল্লেন ঃ বুনতে শিখেই আমায় একটা ব্লাউজ আর মেসোমশায়কে একটা মাফলার বুনে দেবে রীতু—কেমন ?

—নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই ! আনন্দে আর খুশীতে রীতা চেঁচিয়ে উঠল। তারপর খাওয়া দাওয়া বাড়ী ফেরার পালা।

নতুন বাক্সটাকে সবটুকু সময় রীতা কাছে রেখেছে, একটুও নামায়নি।

বাড়ী ফিরতে সারা রাস্তা তার এক চোখ ঘুম,—কিন্তু বাড়ী এসে জামা কাপড় বদলে বিছানায় শুতে গিয়েই রীতার মনে হলো—টিটুনের জায়গাটা খালি।

—ওমা ! টিটুনকে তো আনা হয়নি, বেচারী সেই বাগানে অন্ধকারে ঝোপঝাড়ে পড়ে আছে—আর যদি বিষ্টি নামে তাহলে সারা রাত ভিজে তার তো ভয়ঙ্কর অসুখ ধরে যাবে—কি জানি সর্দি জ্বর ছাড়া নিউমোনিয়া না কি বলে—তাও হতে পারে।

এ সব ভেবে রীতা বিছানায় উঠে বসলো।

মা বল্লেন ঃ কি হলো রীতু—জল খাবে ?

—না মা, টিটুনকে আনা হয়নি যে ! বাগানে নান্টু তাকে গাছে বেঁধে ছিল—ওর খুব লাগছিল। ছোটমাসী ডাকলেন আর আমি ভুলে গেছি—কি হবে মা ? অন্ধকারে বাগানে পড়ে থাকলে ওর ভয় তো করবেই, অসুখও করতে পারে। তুমি আমায় একটু নিয়ে চলো, আমি নিয়ে আসি ওকে। মা হেসে বল্লেন ঃ কিছু হবে না, বুলু নান্টুরা উঠিয়ে রাখবে। আর এত রাতে তো যাওয়া যায় না—কালকে কাউকে পাঠিয়ে এনে নেবো।

রীতা কি আর করবে। ভাবনা চিন্তায় মনে মনে তার কি যে হচ্ছিল আর বলছিল—হে ভগবান, আজ রাতে যেন বিষ্টি দিও না, টিটুনের তাহলে ভয়ানক অসুখ করে যাবে। ভাবতে ভাবতে রীতা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সব্বাই ঘুমুচ্ছে। ঘর অন্ধকার। এমন সময় রীতার খেলাঘরের আলমারীর পুতুলগুলো কথা বলাবলি করতে লাগলো।

কুচকুচে কালোরঙ-এর সোজা চুল কুচ্ছিত পুতুলটার সব চেয়ে মায়া বেশী, টিটুনকে সে খুব ভালবাসে। সেই কাফ্রী পুতুল বলে উঠলো ঃ তোমরা তো সব শুনলে, এখন টিটুনকে উদ্ধার করা যায় কি করে বল তো ?

—তাই তো আমরাও ভাবছি—সমবেত সুরে বলে উঠলো প্লাস্টিক-এর লরী ড্রাইভার, চীনে মাটির মস্ত চোখওয়ালা কুকুর আর চোখ বোজা, সাজসজ্জা করা রীতার পুতুল মেয়ে।

এমন সময় আলমারীর পিছন থেকে কে বলে উঠলো ঃ আমি খবর আনতে পারি হে, যদি একটু সাহায্য কর তোমরা !

—কে ? কে ? কে ? সবাই জিজ্ঞাসা করে উঠলো।

আলমারীর পিছন থেকে মুখটা একটু বাড়িয়ে বল্লে ঃ আমি লেজওয়ালা ঘুড়ি, রীতার দাদা বিশ্বকর্মা পূজার দিন আমায় উড়িয়ে এইখানে ফেলে রেখেছে।

কাঁচের বৌ পুতুল বল্লে ঃ তাই বুঝি, তা বেশ তুমি ব্যবস্থা করো না দাদা টিটুনের। ওর জন্য আমরা সবাই খুব ভাবছি।



ঘুড়ি বল্লে ঃ সকলে মিলে আমায় যদি জানলা দিয়ে একটু বার করে দিতে পারো—আর ঐ সুতোর শেষটুকু ধরে রাখো তাহলে আমি বেলগাছিয়ার বাগান ঘুরে এসে তোমাদের খবর দিতে পারি—আর যদি কেউ সঙ্গে যাও তাহলে টিটুনকে নিয়ে আসাও যায়।

—নিয়ে আসা যায় ? অবাক হয়ে মিনি আর কুচ্ছিত কাফ্রী পুতুলটা বলে উঠলো।

—কুট্ কুট্ কুট্—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাবো হে ঘুড়ি ভায়া—বাচ্চা ইঁদুর বলে উঠলো।

সবে মাত্র কাটতে শিখেছে শাদা ছোট্ট সুন্দর দাঁত দিয়ে—কি যেন একটা কাটছিল—কিন্তু ঘুড়ির কথা শুনে সে এগিয়ে এলো।

বনাতের ভাল্লুক হাঁসফাস করে বল্লে ঃ সেই ভালো, তুই যা রে নেংটী, ঠিক নিয়ে আসিস খুঁজে কিন্তু।

—সে আর বলতে জ্যাঠামশাই—নেংটী একথা বলেই ঘুড়ির লেজ কামড়ে ধরলো আর সকলে মিলে ধরে ঘুড়িকে জানলা দিয়ে বার করে দিল।

ইঁদুরকে নিয়ে ঘুড়ি বাতাসে ভেসে ভেসে, অত রাতেও ঠিক সেই বেলগেছিয়ার বাগানে পৌঁছল। কিন্তু বেজায় অন্ধকার ! ঘুড়ি বল্লে ঃ কই হে নেংটী, এবার ভাই তোমার কাজ, তুমি টিটুনকে খুঁজে বার করো। আমি এই কাগজের দেহ নিয়ে যদি ঝোপ ঝাড়ে, গাছ আগাছার ভিতরে যাই—একটু লাগলেই ছিঁড়ে ফর্দা-ফাঁই হয়ে যাবো—আমি এইখানে থাকি তুমি ঢুকে যাও বাগানে।

নেংটী ঢুকে পড়লো বাগানে, এদিক ওদিক কাউকে না দেখে টিটুন ! টিটুন ! করে চেঁচাতে শুরু করলো ।

একটু থামে আবার চেঁচায়–টিটুন, টিটুন–কোথায় তুমি আছ উত্তর দাও ।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর–খুব আস্তে উত্তর এলো ঃ এই যে আমি, অন্ধকারে গাছটার সঙ্গে বাঁধা রয়েছি–এইদিকে এসো ।

টিটুনের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে নেংটী সেইদিকে এগিয়ে গেল ।

–হায় ! হায় ! এমন করে তোমায় কে বেধেঁছে টিটুন ? দুঃখিত হয়ে নেংটী জিজ্ঞাসা করলো !

–আর ভাই, সমস্ত গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে–বুলু আর নান্টু এমনি করে বেধেছে । তারা হয়তো এতক্ষণ নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে–আর আমি এখানে । তুমি যদি না আসতে, আমার এই অন্ধকারে কি যে ভয় করছিল কি বলবো । একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা আমার নাকের উপর দিয়ে চক্ষের নিমেষে একটা জাল বুনে ফেললে ।

–আরে আর কিছু ভয় নেই,–বাড়ী নিয়ে যাবো বলেই তো এসেছি । দাঁড়াও বাঁধনগুলো কাটি আগে ।

কুট কুট করে দাঁত দিয়ে নেংটী টিটুনের সব বাঁধন কেটে দিলে ! ব্যাস, টিটুন এখন মুক্ত ।

–বাড়ী যাবো কেমন করে ভাই নেংটী ?

–আমাদের সঙ্গে যাবে, ঘুড়িতে ঝুলে আমি এসেছি । আর যাবার সময় দু'জনেই যাবো । এখন তোমায় বাগানের বাইরে নিয়ে যেতে হবে তো !

দু'জনে বাইরে এসে ঘুড়ির ল্যাজে উঠলো ! নেংটী তার ল্যাজে টিটুনকে বেশ করে বেঁধে নিয়ে ঘুড়ির লেজ কামড়ে ঝুলে পড়লো । ঘুড়ি তাদের নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি টিটুনদের বাড়ীর জানলার কাছে এসে পড়লো ।

খেলা ঘরের সব বন্ধুরা–সারি সারি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল । চাঁদের আলোয় দূর থেকে ওদের আসতে দেখে আনন্দে চীৎকার করে উঠলো ।

কুচ্ছিত পুতুল এগিয়ে এসে বল্লে ঃ অত চেঁচাচ্ছ কেন ?

সেপাই তার বন্দুকটা তুলে বল্লে ঃ কেন, কে কি বলেছে বল, এখনি বন্দুকে তার মাথা উড়িয়ে দেবো ।

–তা কেন ? রীতারা উঠে পড়বে না অত চেঁচালে ?

–সত্যি ঘুড়ির বুদ্ধি আর নেংটীর সাহস না থাকলে আজকে টিটুনকে ওখানেই পড়ে থাকতে হতো–বৌ-পুতুল বল্লে ।

আদুরে সাজগোজ করা পুতুল মেয়ে বল্লে ঃ আজ আর কথাবাত্তায় কাজ নেই, রাত শেষ হয়ে এলো। টিটুন তুমি গিয়ে রীতার পাশে যেখানে শোও শুয়ে পড়গে।

আস্তে আস্তে হামা দিয়ে টিটুন রীতার খাটে উঠে তার পাশে শুয়ে পড়লো। বন্ধুরাও যে যার জায়গায় গিয়ে বসলো।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙে-পাশে টিটুনকে দেখে রীতা আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠে মাকে বল্লে ঃ ওমা তুমি যে টিটুনকে আনতে পাঠিয়েছ তাতো বলনি।

–আমি ? কখন ? না মোটেই না–অবাক হয়ে মা উত্তর দিলেন।

রীতা কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার খেলা ঘরে ফিরে এলো। সব খেলনাগুলোই সাজানো আছে–মনে হলো কুচ্ছিত কাফ্রী পুতুলটা যেন হাসছে আর বলছে আমরা জানি, আমরাই তো টিটুনকে এনেছি।

রীতা মার দিকে ফিরে বল্লে ঃ ঠিক হয়েছে মা, এই সব পুতুলরা ওকে উদ্ধার করে এনেছে–বুঝতে পেরেছি।

মা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্লেন ঃ তাই হবে !



য়্যাকসিডেন্ট



বুবু টুবুদের খেলাঘরের একপাশে ছোট টেবিলের উপর একটা বড় কাচের জারে বেশ বড় লাল মাছ থাকতো। বুবুর দিদির সখ । যখন কেনা হয়েছিল তখন অবশ্য অনেকগুলো ছিল, কিন্তু এখন একটায় দাঁড়িয়েছে। লাল টুকটুকে মাছটা জলের ভিতর ঘুরে বেড়াতো। আজকাল জল বদলে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনও যত্ন হয় না বিশেষ। বেচারী একে একলা পড়ে গেছে, তার উপর সবুজ পাতা বা অন্য কিছু খাবারও পায় না, শুধু জল আর জল ! আবার যেদিন চাকর জল বদলাতে ভুলে গেল সেদিন তো আরো কষ্ট !

একমাত্র সান্তনা যে, রাত্তিরে খেলাঘর থেকে পুতুলগুলো সব উঠে এসে কাচের জারের গায়ে হেলান দিয়ে গল্প করে। ডলি পুতুল, তুলোর ভাল্লুক আর কালোকুচ্ছিত কাফ্রি পুতুলটা। খেলনা পুতুল আরো আছে, কিন্তু এই তিনজনের সঙ্গেই লালমাছের খুব ভাব। প্রতিদিন রাত্রে সবাই এক হয়ে গল্প করে—আবার ভোর হবার আগেই ওরা খেলাঘরে চলে যায়। এমনি করেইদিন কাটছিল !

বাবুদের পুষিটা ভারী বজ্জাত ছিল। সে ঐ যে কুণ্ডলী পাকিয়ে চোখ বুজে বসে থাকে, মনে হয় যেন বুদ্ধের ধ্যান করছে। কিন্তু আসলে তা নয়—সব খবর রাখছে ঐ আধখানা চোখের ভিতর দিয়ে। তার মানে চোখ কান তার সজাগ একেবারে।

রোজ রোজ ঐ ব্যাপার লক্ষ্য করেছে পুষি। সেদিন রাত্রে পুতুলরা মাছের কাছে আসার আগে সে জারের পাশে এসে বসে আছে। মতলব যে লালমাছ তার সোনালি

পাখার ঝাপটা দিয়ে যেই জলের উপর ভাসবে, কথা বলতে আসবে—পুতুলরা এসেছে মনে করে, আর অমনি সে টপ করে ধরে নিয়ে মুখে করে একেবারে দে ছুট। একেবারে ছাদের চিলে কোঠার ঘরের পিছনে বসে তারিয়ে তারিয়ে মজা করে খাবে।

কিন্তু হায়, হায়, এ কী কাণ্ড হলো! পুষির অত লোভ তার শাস্তি আছেই, আর লালমাছের তো কোনো দোষ ছিল না। পরের মন্দ করতেও যায়নি। তাই তার ভালো হবে বৈ কি।

পুষি চেষ্টা করেও যখন লালমাছকে বাগে আনতে পারলো না, তখন সে টেবিলের উপর উঠে জারের মুখের কাছে নুলো বাড়িয়ে ধরতে গেল—আর কি কাণ্ড! হুড়মুড় করে টেবিল থেকে জার মেঝের কার্পেটের উপর পড়ে ভেঙে চুরমার। জল আর কাচের টুকরো সারা মেঝেতে ছড়াছড়ি।

এদিকে লালমাছ তো শুকনো ডাঙায় পড়েছে, তার প্রাণ যায়-যায় অবস্থা!

পুষি তো এই কাণ্ডটার কথা ভাবতেই পারেনি। জার উল্টে ভীষণ শব্দ করে যখন মাটিতে পড়ে গেল, সেই শব্দে ভয় পেয়ে পুষি তিনটে লাফ দিয়ে ঘর ছেড়ে, এমন কি বাড়ি ছেড়ে একেবারে পাশের বাড়ির ছাদের আলসেতে গিয়ে বসে রইল।

পুষি পালালো, লালমাছেরও প্রাণ কন্ঠায় এসেছে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে খেলাঘরের পুতুলরা বেরিয়ে এলো। তাদের দেখে লালমাছ চোখ কপালে তুলে বলল ঃ আমায় শিগ্‌গীর বাঁচাও ভাই, জল না পেলে মরে গেলুম। কিন্তু জল, কোথায় জল! এ ঘরে এক ফোঁটাও জলের চিহ্ন নেই। মেঝেতে কাচের টুকরোর উপর পড়ে লালমাছ হাঁ করছে আর বলছে—'জল জল!' পুতুলরা সব হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। কালোকুচ্ছিত কাফ্রী পুতুল তাড়াতাড়ি বুদ্ধি করে খেলাঘর থেকে পুতুলের প্যারাম্বুলেটারখানা ঠেলে নিয়ে এসে ডলি আর ভাল্লুককে বললে ঃ এখানে কোথাও জল নেই। লালমাছ এখুনি মরে যাবে—শিগ্‌গীর গাড়ি করে ওকে পুকুরের কাছে নিয়ে চলো। এখন রাত্তির, সবাই ঘুমুচ্ছে আর চাঁদের আলো ফুটফুট করছে, আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

ভাল্লুক বল্লে ঃ ঠিক বলেছ, তোমার বুদ্ধি আছে—চলো আমরা ওকে নিয়ে যাই।

ডলি, ভাল্লুক আর কাফ্রী পুতুল তিনজনে মিলে অনেক কষ্টে নেতিয়ে পড়া লালমাছকে গাড়িতে তুলল। তারপর সকলে মিলে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ি থেকে মাঠ, মাঠ থেকে পুকুরের ধারে গিয়ে পৌছলো।

চাঁদের আলোয় সারা মাঠ ভরে গেছে। জলের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে, ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, দু একটা নাম-না-জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে।

ডলি চারিদিকে তাকিয়ে বলল ঃ রাত্তিরটা বাইরে এত সুন্দর কে জানতো ! খেলাঘর ছাড়া আমাদের বাইরে আসার উপায় নেই, লালমাছ এতদিন ছিল, তবু গল্প করে রাত কাটতো ।

কাফ্রী পুতুল খেঁকিয়ে উঠলো ঃ রাখ তোমার কবিত্ব । এদিকে লালমাছ হয়ে গেল, নড়ছে না কথা বলছে না । এতদূর এনে এখন যদি মরে যায় তাহলে দুঃখের সীমা থাকবে না । তাড়াতাড়ি ধর সকলে মিলে ওকে গাড়ি থেকে জলে দিয়ে আসি ।

ডলি বল্লে ঃ তাই তো ! চলো চলো, ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে আমার বাইরে এসে বড্ড ভাল লাগছিল কিনা ।

গাড়ির কাছে শুধু ভাল্লুক দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে লালমাছ অসাড় হয়ে পড়ে আছে । তাড়াতাড়ি সকলে মিলে ধরে তাকে জলে ছেড়ে দিল । একটুখানি পরে লালমাছ নড়েচড়ে উঠলো । ভাল্লুক মোটা গলায় বললে ঃ হয়েছে কাফ্রী, হয়েছে, লালমাছ এ যাত্রা বেঁচে গেছে । ঐ দেখ হাঁ করে জল খাচ্ছে ।

ডলি আর কাফ্রী পুতুলের চোখ দুটো চাঁদের আলোয় চিকচিক করে উঠলো । বললে ঃ ভালই হলো, প্রাণটা রক্ষে পেয়েছে । জলের ধারে আরো কিছুক্ষণ সকলে বসে রইল । তারপর ভাল্লুক বললে ঃ আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক হবে না, চল আমরা এবার যাই । লালমাছ ভালই আছে ।

কাফ্রী পুতুল একটু এগিয়ে নেমে বললে ঃ লালমাছ, আজ আমরা যাচ্ছি, তুমি বেশ ভাল আছ তো ? কাল আবার আমরা খবর নিতে আসবো ।

লালমাছ জলের ভিতর থেকে মুখটা তুলে বললে ঃ ভাল আছি । ধন্যবাদ তোমাদের ভাই, কাল আবার দেখা হবে ।

ভাল্লুক আর পুতুলরা ফিরে এলো তাদের খেলাঘরে—যে যার শুয়ে পড়লো ।

সকালে বুবু খেলাঘরে এসে দেখে মাছের জার ভাঙা, কাচের টুকরোয় ঘর ভরে



গেছে। ব্যাপারটা কি হয়েছে তা বোঝা গেল না। খেলাঘরে গিয়ে দেখলো, সাদা ভাল্লুকের পায়ে, ডলি আর কাফ্রী পুতুলের জুতোয় কাদার দাগ। এ কাদার দাগ কোথা থেকে এলো তা বুবু কিছুতেই ভেবে পেলো না। লালমাছের শোকে তখন তার কান্না এসে গেছে।

সেদিন রাত্রে আবার পুতুলরা উঠে, পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়লো। বুবুদের দারোয়ানটা তখনও ঘুমোয়নি। সবে আলো নিভিয়ে একটা বাতি জ্বেলে সে সুর করে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছিল। কিন্তু এত কম আলো যে, পুতুলরা পা টিপে টিপে তার সামনে দিয়ে চলে গেল অথচ সে দেখতে পেলো না।

সকলে মিলে আবার জলের ধারে গিয়ে পৌঁছলো। ডলির তো এত ভালো লাগছিল যে, সে ঘাসের উপর বসে পড়লো। কাফ্রী পুতুল ধমকে উঠলো ঃ আবার! পোশাকের একটুও যত্ন নিচ্ছ না। আবার বুবু এসে যখন বলবে, কাদা লাগলো কি করে?

ডলি একটু আরামপ্রিয়। আড়ামোড়া ভেঙে বললো ঃ তা হোকগে মাসী বেশ লাগছে, একটু বসি।

এর মধ্যেই লালমাছ এসে গেছে কাছাকাছি। জলের ভিতর থেকে, মুখটা উঁচু করে দিয়ে বললে ঃ এসেছ ভাই তোমরা।

কাফ্রি বললে ঃ কেমন আছ তুমি?

—বেশ ভাল আছি ভাই! এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে আবার লালমাছ বললে ঃ শুধু জল তো নয়, সবুজ লতাপাতা, গুগ্‌লী, শামুক কত কি যে খাবার জিনিস তা আর কি বলবো। এসব না হলে কি আমরা বাঁচতে পারি?

ভাল্লুক বললে ঃ তা তো বটেই।

ডলি বললে ঃ এমন চাঁদের আলো এর আগে দেখিনি, ইলেকট্রিকের আলোয় চোখ যেন কেমন হয়ে গেছে।

কাফ্রী পুতুল কুচ্ছিত হলে কি হবে, জামাকাপড়ের বিষয়েখুব সাবধান, মাটিতে না বসে একটা মোটা গাছের নীচের গুড়িতে বসে পা দোলাতে দোলাতে গুন্ গুন্ করে গান ধরেছিল।

ভাল্লুক তার দিকে চেয়ে লালমাছকে বললে ঃ তোমার এখানে আসাটা একটা য়্যাকসিডেন্ট বা দুর্ঘটনা বলতে পারো।

লালমাছ একবার জলের ভিতর মুখ ডুবিয়ে আবার মুখ তুলে হেসে বললে ঃ দুর্ঘটনা? এমন দুর্ঘটনা হয়েছিল বলে বেঁচে গেলাম। কাচের জারের মধ্যে আমার আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। মানুষদের সখের জন্য আমাদের জীবন যায়। এই দুর্ঘটনা

আমার জীবন দিয়েছে। ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে। লালমাছ খুসী হয়ে সোনালি পাখা দিয়ে জলে ঝাপটা দিল।

ডলি বললে ঃ তা বটে, তোমার জন্য আমরাও খেলাঘরের বাইরের পৃথিবী দেখলাম–এমন চাঁদের আলো, এমন খোলা মাঠ, এত সুন্দর হাওয়া–

ভাল্লুক ধমকে উঠলো ঃ আর কবিত্ব করতে হবে না খুব হয়েছে, কাফ্রী আবার গান ধরেছে। চলো্ শিগ্‌গীর সব ফিরে।

ডলি বললে ঃ তোমার ভালো লাগছে না বুঝি ?

–লাগলে কি হবে, ফিরতে হবে না ? লালমাছ যখন ভালো আছে, এবার চলো আমরা যাই।

লালমাছ বললে ঃ তোমরা কিন্তু রোজ এসো ভাই, কেবল বিষ্টিবাদলা হলে বেরিয়ো না। আর আমি যে কোথায় আছি, সে খবর কাউকে দিও না।

সে রাত্রে সবাই লালমাছকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে চলে এলো।

লালমাছ জলের ভিতর আরামে বাস করতে লাগলো। এখন যেমন মোটাসোটা তেমনি সুন্দর দেখতে হয়েছে সে। ইচ্ছা করলে তোমরা গিয়ে দেখে আসতে পারো।



আমাদের জনপ্রিয় শিশু



প্রফুল্ল রায়
- পাগল মামার চার ছেলে ১২ ০০
- সেনাপতি নিরুদ্দেশ ১০ ০০
- তিন মূর্তির কীর্তি ১২ ০০

কেনেথ্ অ্যাণ্ডারসন
- ক্রিসেন্ট পাহাড়ের নরখাদক ১৫ ০০

নরমান কার
- কাফুর সিংহ ১০ ০০
(ভাষান্তর ঃ পরিতোষ মজুমদার)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- জুলভের্নের গল্প ১০ ০০
- পৃথিবী কী করে বাঁচলো ১০ ০০

জেকব দুই দুই আর ফণাধর
- দন্ত পাটি মুখোমুখি ৬ ০০
- মিডনাইট (র‍্যান্ডলফ স্টো) ১০ ০০
- ঘন্টা বাজে দুরে ২০ ০০
(হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের জীবনী)

শ্রাবন্তী ঘোষ
- চিকি আর নদী ৬ ০০

লীলা মজুমদার
- কিশোর বিচিত্রা ২০ ০০
- লীলা মজুমদারের ছোটদের সমগ্র নাটক ২০ ০০

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
- মিঠুয়ার বন্ধু ডলফিন ৬ ০০

সুবোধকুমার দাশগুপ্ত
- চোধুরী বাড়ির চৌহদ্দি ১২ ০০

গিরিধারী কুণ্ডু
- দুষ্টু টুসটুসি ৮ ০০
- বুলাই ৬ ০০

মানসী বড়ুয়া
- সাগর পারের রূপকথা ১২ ০০
(বি-বি-সি দে'জ-এর যৌথ উদ্যোগে)

শৈলেন ঘোষ
- হো-বুড়োর খুদে বন্ধু ১০ ০০
- পিরামিডের দেশে ১০ ০০

রনাল্ড সেগাল
- টোকোলোশ ১০ ০০
- অনুঃ সুবীর রায়চৌধুরী

আনন্দ বাগচী
- ভূতরহস্য ১০ ০০

কিন্নর রায়
- আলেকজাণ্ডারের বর্ষা ৮ ০০

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
- কর্পূরের মতো ৮ ০০

পরিচয় গুপ্ত
- দৈত্য যখন ভয়ঙ্কর ৩০ ০০
- ভৌতিক শিকার কাহিনী ৭ ০০
- আষাঢ়ে ভূতের গল্প ১৫ ০০
- ভূত যখন পুত ৫ ০০
- মানুষ যখন ভয়ঙ্কর ৭ ০০
- মরণের মুখোমুখি ৭ ০০
- ছায়ামূর্তি ৬ ০০

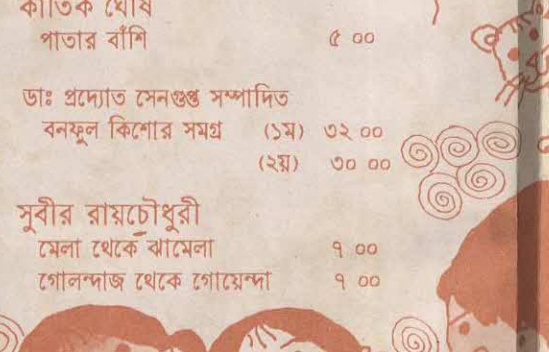
পূর্ণেন্দু পত্রী
- ছড়ায় মোড়া কলকাতা ১০ ০০
- কলকাতার প্রথম ১২ ০০
- ওদের চোখে মোদের ভারত ১২ ০০
- হাসতে হাসতে খুন ১২ ০০

শৈবাল চক্রবর্তী
- পথিক রাজপুত্র ১০ ০০

কার্তিক ঘোষ
- পাতার বাঁশি ৫ ০০

ডাঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত সম্পাদিত
- বনফুল কিশোর সমগ্র (১ম) ৩২ ০০
- (২য়) ৩০ ০০

সুবীর রায়চৌধুরী
- মেলা থেকে ঝামেলা ৭ ০০
- গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা ৭ ০০



দে'জ পাবলিশিং

...ও কিশোর সাহিত্য

অর্ধেন্দু দত্ত

শিকারের গপ্‌পো	১০ ০০

শংকর

এক ব্যাগ শংকর	১২ ০০
চিরকালের উপকথা	১২ ০০

নারায়ণ সান্যাল

ডিজনেল্যাণ্ড	২৫ ০০
না-মানুষের পাঁচালী	১২ ০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

হাতি ধরিয়ে নায়ার	১০ ০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

হ্যানস্ অ্যাণ্ডার সনের গল্প	১৫ ০০
কিশোর সম্ভার	৩০ ০০
গড়জঙ্গলের কাহিনী	১৫ ০০
ছোটদের বেতালের গল্প	১২ ০০
পাতাল পুরীর কাহিনী	১২ ০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জঙ্গলের চাবি	২০ ০০
আকাশ দস্যু	১৫ ০০
বরণীয় মানুষ ঃ স্মরণীয় বিচার	১৫ ০০

অনিলকুমার চক্রবর্তী

ছোটদের রাজমালা	১২ ০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পিন্ডিদার পঞ্চবান	১৮ ০০
লিডার বটে পিনডিদা	১২ ০০
পিনডিদার গপ্‌পো	১০ ০০
সিকেপিকেটিকে	১৫ ০০
ফয়সালা	১২ ০০

ইন্দিরা দেবী

বুনুর অসুখ	৮ ০০
গল্প বলছি ইন্দিরাদি	১০ ০০

ফণিভূষণ আচার্য

সোনার সুটকেস	৬ ০০

ধর্মদাস মিত্র

মাষ্টারমশাই	৬ ০০

সৈয়দ মুজতবা সিরাজ

রহস্য রোমাঞ্চ	১২ ০০
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস	৩২ ০০
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর	১৪ ০০
হাট্টিম রহস্য	১২ ০০
কালোমানুষ নীল চোখ	১৬ ০০
কালো বাকসের রহস্য	১০ ০০
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ	৮ ০০
বনের আসর	১০ ০০
ভয়-ভুতুরে	৬ ০০
নিঝুম রাতের আতঙ্ক	৭ ০০
টেরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর	৭ ০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দুনিয়ার ঘনাদা	১৫ ০০
পিপড়ে পুরান	১০ ০০
পাতালে পাঁচবছর	১৫ ০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অক্ষরে অক্ষরে	৮ ০০
কথার কথা	১০ ০০

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

রাশি রাশি হাসি	১৫ ০০
ভূত অদ্ভুত	৮ ০০
বাজপাখির চোখ	১২ ০০

শঙ্খ ঘোষের ছড়া
গনেশ পাইনের ছবি

সব কিছুতেই খেলনা হয়	১০ ০০

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

হলুদ আতঙ্ক	৮ ০০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডোরাকাটার খোঁজে	১৪ ০০
সুন্দর বনের আতঙ্ক	১৫ ০০
বাক্‌লার জঙ্গলে	১০ ০০
শিকারের বিচিত্র কাহিনী	২০ ০০
বাঘ বাঘিনী	১৫ ০০

সুনির্মল বসু

জীবন্ত কঙ্কাল	১৫ ০০
ছোটদের বিদ্যাসাগর	৭ ০০

